মার্ক পেরাখের 'আন ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' :
আমাদের মহাবিশ্ব কি সত্যই কোন বুদ্ধিদীপ্ত সজ্ঞাত সত্ত্বার তৈরী?

অভিজিৎ রায়

মার্ক পেরাখ (Mark Perakh) নামটি হয়ত আমাদের বাঙালী পাঠক সমাজে অপরিচিতই। অপরিচিত হবারই কথা; কারণ কিছুদিন আগেও ভদ্রলোক ছিলেন ক্যালস্টেট ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। সম্প্রতি অত্যন্ত সম্মানিত 'Emeritus' status নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বললেই চোখের সামনে আত্ম -ভোলা, সারাদিন ল্যাব-রিসার্চ নিয়ে পড়ে থাকা 'পক্ককেশ বিজ্ঞানী'র যে ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অধ্যাপক পেরাখের পরিচিতিটা ছিল অনেকটা সেরকমই। প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ায় জন্মগ্রহনকারী এ বিজ্ঞানী তার পেশাগত জীবনের পুরোটুকুই ব্যয় করেছেন বিজ্ঞানের নিবিড় সাধনায়, লিখেছেন তিনশ'রও বেশী গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ আর বই। তার গবেষণা কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারের বর্ণিল জীবনে পেয়েছেন সাইবেরিয়ান ব্রাঞ্চ অব একাডেমিক সায়েন্স, জার্মান কাউন্সিল ফর রিসার্চ্ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, রয়াল সোসাইটি অব ইংল্যান্ড সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে নানা ধরণের সন্মানসূচক পুরস্কার।

এহেন নির্ঝঞ্ঝাট 'বিজ্ঞানের নিবিড় সাধক'টিও একটা সময় ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাগত জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর হাতে কলম তুলে নিলেন; সারা পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান আর ছদ্ম-বিজ্ঞানের যে প্রচার আর প্রসার চলছে তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে। ডঃ পেরাখের নিজের ভাষাতেই :

> 'After my retirement from the university I became interested in debunking various kinds of crank science. I have written a series of articles about the so-called Bible code. My article on that subject has also been printed in Russian in the Kontinent journal (no 103, 2000) that is being published in Moscow. Then I switched to reviewing books by religious authors who purportedly prove the compatibility of the Bible with science. This led gradually to writing articles debunking such crank science as the so-called Intelligent Design, and the like....'

অধ্যাপক পেরাখের 'আন-ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' বইটি তাঁর যুক্তিবাদী প্রেরণারই ফসল; তবে এই সাম্প্রতিক বইটি লিখবার একটি নির্দিষ্ট কারণ আছে। সম্প্রতি কিছু দার্শনিক এবং কিছু 'বিশ্বাসী বিজ্ঞানী'র পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারনা করে একটু ভিন্নভাবে মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে

জনপ্রিয় যেটি হল : সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প (Intelligent Design argument), সংক্ষেপে *আই.ডি*। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, জর্জ এলিস, ফিলিপ জনসন প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এমন কিছু চলক বা ভ্যারিয়েবলের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) সাহায্যে তৈরী হয়েছে যে এর একচুল হের ফের হলে আর আমাদের এ পৃথিবীতে কখনই প্রাণ সৃষ্টি হত না। অর্থাৎ, পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই ইচ্ছাটি মাথায় রেখে ঈশ্বর (কিংবা হয়ত অন্য কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বা) বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করেছিলেন, আর সে জন্যই আমাদের মহাবিশ্বঠিক এরকম; এত নিখুঁত, এত সুসংবদ্ধ। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মহাবিশ্ব সৃষ্টির পাছনে ঈশ্বর জড়িত থাকবার ব্যাপারটা মুখ ফুটে সরাসরি না বললেও সেদিকেই প্রায়শঃ ইঙ্গিত করে বলেন, বৈজ্ঞানিক ডেটা গুলো শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিংবা উচিৎ ও নয়, এগুলোকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে তখনই, যখন এক সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বার (intelligent agent) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে এগুলোকে দেখার চেষ্টা এবং বিশ্লেষণ করা হবে। এই 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' বা সংক্ষেপে '**আই.ডি**' ইদানিংকালে কারো কারো কাছে এতটাই গুরুত্ব পেয়েছে যে, তাঁরা অনেকেই এই তত্ত্বটিকে বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত করে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান, এবং এ নিয়ে এক ধরনের আন্দোলনও তারা শুরু করেছেন সারা বিশ্বব্যাপী। গত সপ্তাহে খবরের কাগজগুলোতে দেখলাম আমেরিকার ডোভার পেনসিলভেনিয়া স্কুল বোর্ড বিবর্তনতত্ত্বের পাশাপাশি এই আই.ডিও 'বিকল্প তত্ত্ব' (Alternative Theory) হিসেবে সেখানকার ছাত্রদের পড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে (যদিও সর্বশেষ খবর অনুযায়ী *আমেরিকান সিভিল লিবারিটিস ইউনিয়ন* এবং *আমেরিকান ইউনাইটেড অব সেপারেশন চার্চ এন্ড স্টেট* স্কুল বোর্ডের এ সিদ্ধান্তকে 'আমেরিকার সংবিধান পরিপন্থী' দাবী করে একটি মামলা দায়ের করেছে, এবং স্কুল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আগামী মাস থেকে পরিবর্তিত জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে তারা 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' অন্তর্ভুক্ত করছে না) ।

আলোচিত বইটিতে অধ্যাপক পেরাখ বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী দৃষ্টি দিয়ে অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠভাবে আই.ডি প্রবক্তাদের সমস্ত যুক্তি খন্ডন করেছেন, আর উপসংহার টেনেছেন অনেকটা জোড়ালো ভাবেই - আই.ডি মোটেই বিজ্ঞান নয়। ডঃ পেরাখের এ বইটি বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের জগতে একটি সত্যিকার মাইলফলক হিসেবে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটর সায়েন্সের অধ্যাপক ব্রেন্ডান ম্যাকে এই বইটি প্রসঙ্গে বলেছেন,

> *'ইদানিংকালের ধর্মবাদী কিছু গোড়া বিজ্ঞানী একজোট হয়ে নানা ধরনের জটিল আর প্যাঁচালো গাণিতিক নোটেশনের অবতারনা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষজনকে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন'*

তাদের এক চতুর অভিসন্ধি। সাধারণ মানুষেরা যেহেতু বিজ্ঞানের জটিল বিষয়-আশয় গুলো ঠিকমত বোঝে না, তারা সহজেই বিভ্রান্ত হয়। আর এই বিভ্রান্তি থেকেই আমাদের মুক্তি দিতে এসেছেন ডঃ মার্ক পেরাখ। তিনি অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে ধীরে ধীরে আই.ডি প্রবক্তাদের ইচ্ছাকৃত ভাবে করা অহেতুক জটিল গাণিতিক বিমুর্ততার খোলস উন্মোচন করেছেন, আর সেই সাথে তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন একজন পেশাদার বৈজ্ঞানিকের মতই।'

বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন প্রথিতযশাঃ পদার্থবিজ্ঞানী এমিরিটাস অধ্যাপক ভিকটর স্টেংগর (কলারাডো বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ ম্যাট ইয়ং (কলোরাডো স্কুল অব মাইনস), এমিরিটাস অধ্যাপক পল গ্রস (ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), জেফ্রি শ্যালিট (ওয়াটর লু বিশ্ববিদ্যালয়), রাশিয়ান একাডেমী অব হিউম্যানিটিসের পুরোধা ডঃ সিমেন টি. ভাইম্যান সহ অনেকেই। ২০০৪ সালের প্রথম দিকে 'প্রমিথিউস বুকস' নামক প্রখ্যাত প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হবার পর বইটির উপর আলোচনা হয়েছে *The Journal of Scientific Exploration* , v. 17, No 4, 2004, *the Australian Humanist*, Winter 2004, in the *Quarterly Review of Biology*, v.79, September 2004, *Evolution and Development*, 6:4, 2004, *The Skeptic*, Summer 2004, the *Skeptical Inquirer*, July-August 2004; *Fortean Times*, 183, 2004; *Today's Books*, February 2004 -এ. এছাড়াও মুক্ত-মনা ওয়েব সাইটের সুপারিশ করা বইয়ের তালিকাতেও বইটি রয়েছে এটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই। *Campus Inquirer* নামের একটি ওয়েব-সাইট এই বইটিকে 'মাসের সেরা বই' হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

ডঃ পেরাখ তার বইটিকে সাজিয়েছেন মূলতঃ তিনটি ভাগে । প্রথম ভাগে (প্রথম অধ্যায় থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত) তিনি 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প' বা ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন থিওরী নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। উইলিয়াম ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে আর ফিলিপ জনসন - আইডির তিন প্রাণপুরুষের ডিজাইন তত্ত্বের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিশ্বাস-নির্ভর সৃষ্টিতত্ত্বকে ডঃ পেরাখ অত্যন্ত জোড়ালোভাবে খন্ডন করেছেন। বইটির দ্বিতীয় ভাগে (৪র্থ অধ্যায় থেকে এগারতম অধ্যায়) ডঃ পেরাখ মুলতঃ খড়গহস্ত হয়েছেন কিছু বাইবেল-বিশ্বাসী 'বিজ্ঞানী' পদবীধারী 'খ্রীস্টান শমশের আলী'দের (হুগ রস, শ্রোডার প্রমুখ) উপর যারা ইদানিংকালে বাইবেলে বর্ণিত কাল্পনিক গল্পকাহিনী আর আয়াতে আধুনিক বিজ্ঞানের গন্ধ খুঁজে পান। আর বইটির শেষভাগে এসে বিজ্ঞান, ছদ্মবেশী বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞান নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

ডঃ পেরাখের বইটি নিয়ে গভীর আলোচনায় যাওয়ার আগে 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প'-ব্যাপারটা একটু বিস্তৃতভাবে পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যা করা যাক। মাধ্যাকর্ষণের কথা দিয়েই বরং শুরু করি। নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে একটি ধ্রুবক ব্যবহার করেছিলেন যাকে আমরা

বলি নিউটনীয় ধ্রুবক, বা *গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট* । নিউটন তার সেই বিখ্যাত সূত্রে দেখিয়েছিলেন, দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণবলের পরিমান ঠিক কতটা হবে সেটা নির্ণয়ে এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট নামের রাশিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ওই ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত আকর্ষণ বলের পরিমাণও যেত বদলে। সাদা চোখে মনে হবে যে ব্যাপারটা সামান্যই, আকর্ষণ বল বদলালেও বোধ হয় তেমন কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ওই ধ্রুবকের মান আসলে আমাদের এই পরিচিত বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে। ওটার মান এখন যা আছে তা না হয়ে যদি অন্য ধরণের কিছু হত তা হলে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডটাই হত অন্যরকম। ওই ধ্রুবকের মান ভিন্ন হলে তারাদের মধ্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে দিত বদলে। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এর উপরই নয়, মহাকর্ষ এবং দুর্বল পারমানবিক বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তারা দেখিয়েছেন, দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তি যদি একটু বেশী হত, এই মহাবিশ্বে পুরোটাই মানে শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেনে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটেরিয়াম (এটি হাইড্রোজেনের একটি মাসতুত ভাই, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'আইসোটোপ') আর হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তিমত্তা আরেকটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে শতকরা একশ ভাগই হত হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যোগ দিয়ে হাইড্রোজেন তৈরীতে বাঁধা দিত। কাজেই এ দু' চরম অবস্থার যে কোন একটি সঠিক হলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজি তৈরী হওয়ার মত অবস্থাই কখনও তৈরী হত না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরনীতে কার্বন-ভিত্তিক প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার, বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের ভর মাপতে গিয়ে দেখেছেন তা নিউট্রন-প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম যার ফলে তারা মনে করেন, একটি মুক্ত-নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও অ্যান্টি-নিউট্রিনোতে পরিনত হতে পেরেছে। যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশী হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন সমস্ত ইলেকট্রন আর প্রোটন সব একসাথে মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিনত হয়ে যেত। এর ফলে যেটা ঘটত সেটা আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে খুব কম পরিমানে হাইড্রোজেনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত আর তা হলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানীই হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত না। জন ডি. ব্যরো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরনের নানা ধরনের রহস্যময় 'যোগাযোগ' তুলে ধরে একটি বই লিখেছেন ১৯৮৬ সালে, নাম- 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল অথবা কসমলজিকাল ধ্রুবকগুলোর মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি মানুষের আবির্ভাবের জন্য এই মৌলিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান ঠিক এমনই হওয়া দরকার ছিল

- সে জন্যই ওগুলো ওরকম। দৈবক্রমে ওগুলো ঘটে নি, ররং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার (বিধাতার) একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিয়ম-নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করবার এই যুক্তিকে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' বা 'নরত্ববাচক যুক্তি'। গনিতবিদ এবং দার্শনিক ডঃ উইলিয়াম ডেম্বস্কি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology' বইয়ে তথ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, আমাদের এই মহাবিশ্বের ভিতর যে ধরনের বিমূর্ত তথ্য লুকানো আছে তা কোন ভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট হতে পারে না। বায়োরসায়নবিদ ডঃ মাইকেল বিহে তাঁর 'Darwins Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution' (১৯৯৬) বইয়ে 'Irreducible complexity' নামক একটি নতুন শাব্দিক পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন, স্রেফ প্রাকৃতিক নিয়মে সরল অবস্থা হতে জটিল জৈব-অভিব্যক্তির মাধ্যমে আজকের জটিল জীবজগতের সৃষ্টি হতে পারেনা।

এধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে খুব আকর্ষনীয় দেখালেও, অনুসন্ধিৎসু সংশয়বাদী চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ ব্যারো এবং টিপালার যে যুক্তি দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে এটি ধরেই নেওয়া হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে যে ভাবে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া আর অন্য কোনভাবে প্রাণ সৃষ্ট হতে পারবে না। এই সজ্ঞাত ধারণাটি কখনই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। যেমন, বিজ্ঞানীরা কিন্তু কার্বনের পাশাপাশি সিলিকন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশকেও ইদানিং কালে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। প্রকৃতিতে পাওয়া ডায়াটম (জীববিজ্ঞানের ভাষায় এটি এক ধরনের eukaryotic algae) এমনি একটি উদাহরণ। এছাড়াও আমাদের কম্পিউটারে, রবোটে সিলিকন ভিত্তিক চিপের ব্যাপক ব্যবহার কার্বন ভিত্তিক প্রাণের পাশাপাশি আগামীর পৃথিবীতে সিলিকনভিত্তিক কৃত্রিম প্রাণের বিকাশের গুরুত্বকেও স্পষ্ট করে তোলে। আবার আমরা প্রায়শঃই শুনি যে, আমাদের পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি সঠিক অনুপাতে না থাকত, তবে নাকি প্রাণের বিকাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীটা ২৩.৫ ডিগ্রীতে হেলে আছে, তার এক চুল এদিক ওদিক হলে তাপ আর চাপের এমন বৈষম্য তৈরী হত যে, প্রাণ সৃষ্টিই অসম্ভব একটি ব্যাপারে পরিণত হত। কিন্তু অনেকেই প্রাণের এই ধরনের 'সঙ্কীর্ণ' সংজ্ঞার সাথে একমত পোষণ করেন না। তারা বলেন, আমরা ওই ধরণের 'সর্বোত্তম' পরিবেশে বিকশিত হয়েছি বলে আমরা মনে করি প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক ওধরণের পরিবেশই লাগবে। যেমন, বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, চাপ, তাপ ইত্যাদি। এগুলো ঠিক ঠিক অনুপাতে না থাকলে নাকি জীবনের বিকাশ ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত ধারণা, প্রামাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন বিকাশের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নীচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। সমুদ্রের গভীর তলদেশে এমনকি কেরসিন তেলের ভিতরের বৈরী পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ

ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে - যে পরিবেশের সাথে আসলে আমাদের সংজ্ঞায়িত 'সর্বোত্তম পরিবেশের' কোনই মিল নেই। কাজেই হলফ করে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান অন্যরকম হলে এই মহাবিশ্বে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ অধ্যাপক ভিকটর স্টেংগর তার 'The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology' বইয়ে দেখিয়েছেন চলক আর ধ্রুবকগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মতই অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য কোন সুক্ষ্ণ সমন্বয় বা 'ফাইন টিউনিং' এর কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য তিনি 'মাঙ্কি গড' নামের একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছেন যার প্যারামিটারগুলোতে নির্বিচারে মান বসিয়ে সেই তথাকথিত 'অ্যানথ্রোপিক কোইন্সিডেন্স' ঘটানো যায়, ঈশ্বরের বা অন্য কোন সজ্ঞাত সত্ত্বার হাত ছাড়াই।

'ফাইন টিউনিং' আর্গুমেনটের এর সমালোচনা করেছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গও। তিনি 'A Designer Universe?' প্রবন্ধে এ ধরনের যুক্তির সমালোচনা করে বলেন :

> *'কোন কোন পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কিছু ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সূক্ষ-সমন্বয় (fine-tune) ঘটেছে যেগুলো জীবন গঠনের সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এ ভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পণা করে বিজ্ঞানের সব রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এই ধরনের সুক্ষ্ণ-সমন্বয়ের ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই।'*

সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি শুধু জ্যোতির্বিদ্যায় নয়, খুব উচ্ছ্বাসের সাথে ইদানিং ব্যবহার করা হয় জীববিজ্ঞানেও। কিন্তু মজার ব্যাপার হল জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা যে ভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা দেন ঠিক উলটো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা বলেন আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **অনুপযুক্ত** যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোর্তিবিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার' রা উলটো ভাবে বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **উপযুক্ত** যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। একসাথে দুই বিপরীতধর্মী কথা তো সত্য হতে পারে না। আসলে মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিক স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্স সহ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন এই 'ফাইন টিউনিং' বা 'এনথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো সেই পুরোন 'গড ইন গ্যাপস' আর্গুমেন্টেরই নয়া সংস্করণ। যেখানে রহস্য পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সেখানেই ঈশ্বরকে আমদানী করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে। এভাবে

মুক্ত-বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে প্রকারন্তরে নতি স্বীকারে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে।

আসলে অনেক বিজ্ঞানীই আজ এই মতের সাথে পুরোপুরি আস্থাশীল যে, মহাবিশ্ব মোটেও আমাদের জন্য 'ফাইন টিউনড' নয়, বরং আমরাই এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে 'ফাইন টিউন্ড' করে গড়ে নিয়েছি- 'The universe is not fine-tuned for humanity; Humanity is fine-tuned to the Universe'। ব্যাপারটা হয়ত মিথ্যে নয়। আমদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনি পর্যন্ত -এই সীমার তড়িচ্চুম্বক বর্ণালিতেই কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হল, আমাদের বায়ুমন্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুচ্ছে। কাজেই সেই অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের চোখও সেভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। এখন এই পুরো ব্যাপারটিকে কেউ উলটোওভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। বলতে পারেন যে, কোন এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বা আমাদের চোখকে কে লাল থেকে বেগুনী আলোর সীমায় সংবেদনশীল করে গড়বেন বলেই বায়ুমন্ডলের মাধ্যমে তিনি সেই সীমার মধ্যবর্তী পরিসরের আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করাটা কতটা যৌক্তিক? অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মতনই শোনায়। তারপরও 'ফাইন টিউনার'রা ঠিক এভাবেই যুক্তি দিতে পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান এরকম কেন, বৈজ্ঞানিকভাবে এটি না খুঁজে এর ব্যাখ্যা হিসেবে 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এই ধরণের যুক্তি হাজির করেন। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মূখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরনের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরী করতে, আর তারপর আরো ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন 'মানবতার উন্মেষ' ঘটাতে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না । পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জানি, মানুষ তো পুরো সময়ের একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন?

আসলে শতাব্দী প্রাচীন 'মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভুত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে যাচ্ছেই না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে এসেছি। আমাদের এই পৃথিবীটা যে মহাকাশের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভীরে হারিয়ে যাওয়া একটা নিতান্ত সাধারণ গ্রহ মাত্র, -এটি যে কোন কিছুরই কেন্দ্রে নয় - না সৌরজগতের, না এই বিশাল মহাবিশ্বের - এ সত্যটি গ্রহণ করতে মানুষের অনেকটা সময় লেগেছে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিলে এর বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয় এই ভয়েই বোধ হয় টলেমীর 'ভূ-কেন্দ্রিক' মডেল জনমানসে রাজত্ব করেছে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে, আর ধর্ম বিরোধী সত্য উচ্চারণের জন্য

কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিওদের সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) যখন চার্লস ডারউইন এবং এ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও 'মন থেকে নিতে পারে নি' কারণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'সৃষ্টির সেরা জীব' মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয়ে যায়! এই সংস্কারের ভুত এক-দু দিনে দূর হবার নয়। তাই রহস্য দেখলেই, জটিলতা দেখলেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির মাঝখানে রেখে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের মাঝখানে বসিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। 'ফাইন-টিউনিং' আর 'অ্যানথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো এজন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষনীয় বলে মনে হয়।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি কিছু গোঁড়া খ্রীষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভুত একটি বিশ্বাস-নির্ভর ধারণার চতুর অভিব্যক্তি মাত্র এবং এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িতও নয় যে এটির সত্যতা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কখনও নির্নীত হওয়া সম্ভব। সেজন্যই এটি কখনও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী করতে পারে না। ডঃ পেরাখ তার 'Unintelligent Design' বইটির শুরুতেই উইলিয়াম ডেম্বস্কির 'আই ডির সাথে ঈশ্বর বা ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই' - এই দাবীকে নস্যাৎ করেছেন ডেম্বস্কিরই নিজের করা বিভিন্ন উদ্ধৃতি হাজির করে, যে উক্তিগুলোতে ডেম্বস্কির বাইবেল-বিশ্বাসী গোড়া খ্রীষ্টানের অবয়বটি মূর্ত হয়ে ওঠে। আর এ কথাও তো কারো অজানা নয় যে আইডির দুই পুরোধা ডেম্বস্কি আর বিহে দুজনই 'ডিসকভারি ইনস্টিটিউট' নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত যা খ্রীষ্টান মৌলবাদীদের অর্থে পরিচালিত হয়। তবে মার্ক পেরাখের বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু 'আইডি' ওয়ালাদের সুপ্ত উদ্দেশ্য খোঁজাতেই ব্যাপৃত থাকে নি, সেই সাথে ডঃ পেরাখ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়েই অপবিজ্ঞানকে খন্ডন করেছেন। যেমন, তিনি সম্ভাবনার যুক্তি দিয়েই ডেম্বস্কির সম্ভাবনা তত্ত্বকে (Probability theory) খন্ডন করেছেন, নিরথর্ক প্রমাণ করেছেন ডেম্বস্কির তথাকথিত জটিলতা তত্ত্বকে (Complexity theory); ডেম্বস্কি প্রস্তাবিত 'Law of conservation of Information' আসলে পরষ্পর বিরোধী একটি জিনিস - তা খুব স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন, আর দেখিয়েছেন ডেম্বস্কি যে তাপগতিবিদ্যার একটি নতুন (৪র্থ) নিয়ম প্রবর্তন করতে চান, তা আসলে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে লংঘন করে। ডঃ পেরাখ ডেম্বস্কির ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে খন্ডন করা অধ্যায়টির নাম দিয়েছেন - 'A consistent Inconsistency'। অনেকের মতে স্রেফ এই একটি অধ্যায়ই এককভাবে বই হিসেবে আত্মপ্রকাশের দাবী করতে পারত। ঠিক একই ভাবে ডঃ পেরাখ মাইকেল বিহের 'Irreducible complexity'কে খন্ডন করেছেন 'Irreducible Contradiction' নামক অধ্যায়ে। তবে ডঃ পেরাখ সবচাইতে বেশী মুখর হয়েছেন ফিলিপ জনসনের উপর, যিনি পেশায় ইউ. সি বার্কলের আইন বিভাগের অধ্যাপক। এই আইনজ্ঞ বিজ্ঞানের কোন

পেশার সাথে জড়িত না থাকা সত্ত্বেও আজকের দিনের বিখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীদের সকল মতামতকে এক ফুঁ এ উড়িয়ে দিতে চান। যেমন, ফিলিপ জনসন তার ‘The Wedge of Truth’ বইয়ে বলেছেন, ডারউইনবাদীরা নাকি ইন্টিলিজেন্ট আর আন ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইনের পার্থক্য বোঝে না। ডঃ পেরাখ জনসনের উপর পালটা একহাত নিয়ে বলেছেন, ‘তাই নাকি মিস্টার জনসন? ডারউইনবাদী বিজ্ঞানীরা কি এতই নির্বোধ যে, তাদের এখন একজন আইনবিদ দরকার হয়ে পড়েছে বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়-আশয়গুলো বুঝবার জন্য?’ (*আনইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন*, মার্ক পেরাখ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৫১) ডঃ পেরাখ জনসনকে ডেকেছেন ‘A militant dilettante’ নামে আর জনসনের উপর আক্ষরিক অর্থেই খড়্গ চালানো অধ্যায়টির নাম দিয়েছেন ‘A militant Dilettante in Judgment of Science ’।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগুচ্ছি। তার পরেও এটি অবশ্যই স্বীকার্য যে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই এখনও ‘ফাঁক’ রয়ে গেছে; রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।   কিন্তু তার মানে এই নয় যে জটিল কিছু দেখলেই বিজ্ঞান তার পেছনে কোন সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে এত সহজেই বৈধতা দিয়ে দেবে। সরল সিস্টেম থেকে জটিল সিস্টেমের উন্নয়নের উদাহরণ প্রকৃতিতে খুঁজলেই অনেক পাওয়া যায়। ঠান্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, কিংবা বাতাস আর পানির ঝাপটায় পাথুরে জায়গায় তৈরী হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতেই আছে। যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে বিচিত্র নক্সার হিমবাহ, কিংবা এক পশলা বৃষ্টির পর পশ্চিমাকাশে যখন উদয় হয় বর্ণিল রংধনুর, মুগ্ধ হয় আমাদের অনেকের মন, কিন্তু আমরা কেউ এগুলো তৈরী হওয়ার পেছনে সজ্ঞাত সত্ত্বার দাবী করি না। কারণ আমরা সবাই জানি ওগুলো সবই তৈরী হয় কোন সজ্ঞাত সত্ত্বার হস্তক্ষেপ ছাড়াই, পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলো প্রাণহীন নিয়মকে অনুসরণ করে। অধ্যাপক মার্ক পেরাখ তার ‘Unintelligent Design’ বইটিতে উইলিয়াম ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে আর ফিলিপ জনসন সহ অন্যান্য আই.ডি প্রবক্তাদের সমস্ত যুক্তি খন্ডন করে উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, আই.ডি কখনই বিজ্ঞান নয়, বরং ছদ্মবেশী বিজ্ঞান, যাকে ইংরেজীতে আমরা বলি pseudoscience. ডঃ পেরাখ তার বইয়ে নিত্যদিনের বেশ কিছু সাধারণ উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন, জটিলতা মানেই বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ নয়, অনর্থক জটিলতা বরং প্রকারন্তরে বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ করে। তাঁর ভাষায়, ‘কোন যন্ত্র তা সে মেকানিকালই হোক আর বায়োমেকানিকালই হোক, যদি অতিরিক্ত জটিল হয়, তা বরং বুদ্ধিহীন উৎসের দিকেই নির্দেশ করে’ (*আনইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন*, মার্ক পেরাখ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২৬)। কাজেই মহাবিশ্বের কিংবা জীবজগতের জটিলতাকে বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের প্রমাণ ভাবার কোন

যৌক্তিকতা নেই। আর তা ছাড়া জীববিদ্যার ব্যাপারগুলো- যেগুলোকে মাইকেল বিহে বলেছেন 'Irreducible complex', সেগুলো আদপেই সেরকম কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। এযুগের প্রথিতযশাঃ সংশয়বাদী, টেনিজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মাসিমো পিগ্লিউসি তাঁর 'Design Yes, Intelligent No: A Critique of Intelligent Design Theory and Neo-creationism' প্রবন্ধে বলেন, জীবজগতে হয়ত বেশ কিছু উদাহরণ আছে যেগুলোকে জীববিজ্ঞানীরা বিবর্তন তত্ত্বের আলোকে এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না; কারণ জীববিজ্ঞানীদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই। কাজেই এটি মূলতঃ *অজ্ঞতা সূচক যুক্তি* (Argument from ignorance), কখনই বিহের তথাকথিত Irreducible complexityর প্রমাণ নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইলিয়াম পিলে যখন প্রথম আঠারো শতকে 'আর্গুমেনট অব ডিজাইন' বা সৃষ্টির অনুকল্পের অবতারণা করেছিলেন, তখন তিনি চোখের গঠন দেখে যার পর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। পিলে ভেবেছিলেন চোখের মত একটি জটিল প্রত্যংগ কোন ভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে বিবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনের জীববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মে চোখের বিবর্তনের ধাপগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন।

আর তাছাড়া আই.ডির বিরুদ্ধে সবচাইতে বড় যুক্তি তো হাতের সামনেই রয়ে গেছে। আমাদের এই 'জটিল' মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে ব্যখার জন্য যদি কোন বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার সত্যই প্রয়োজন হয়, তবে ধরেই নেওয়া যেতে পারে সেই বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বাকে এই মহাবিশ্বের চেয়েও জটিল কিছু হতে হবে। তা হলে সেই জটিল বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করবার জন্য ওই একি যুক্তিতে আবার ততোধিক জটিল কোন সত্ত্বার আমদানী করতে হবে, এমনি ভাবে জটিলতর সত্ত্বার আমদানীর খেলা হয়ত চলতেই থাকবে একের পর এক। এ ধরনের যুক্তি তাই আমাদেরকে অনর্থক অসীমত্বের দিকে ঠেলে দেয়, যা বার্ট্রান্ড রাসেল এবং ডেভিড হিউমের মত দার্শনিকেরা অনেক আগেই অগ্রহনযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়েছেন । যতদিন পর্যন্ত না আই.ডি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যুক্তি আর সংশয়বাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আই.ডি প্রবক্তাদের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ছে না বলেই মনে হচ্ছে।

পাঠকদের একটি মজার তথ্য দিয়ে এই রিভিউটি শেষ করি। মার্ক পেরাখের বইটি *আমাজন ডট কম* (amazon.com)-এর তালিকাভুক্ত হওয়ার পর সর্বোচ্চ ২৯ জন পাঠক বইটির রিভিউ করে সর্বোচ্চ মার্ক 'পাঁচ তারা' প্রদান করেছেন। আমাজনের বর্তমান রেটিং অনুযায়ী বইটির র‍্যাঙ্কিং ৫ এর মধ্যে ৪.৫, যা ডঃ পেরাখের নিজের ভাষায় - 'খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক'। প্রথম 'এক তারা' অর্থাৎ নেগেটিভ রেটিং আমাজানে আসে এক অজ্ঞাত ভদ্রলোকের কাছ থেকে - যিনি তার বক্তব্যটি ওয়েবের পাতায় মুদ্রিত করেন 'Reader from Waco, Tx' নাম নিয়ে। সেই একই ভদ্রলোক আমাজনে আরো কটি মতামত দিয়েছেন কখনও 'Reader from Riesel, Tx' হিসেবে, কখনও বা শুধুই 'Reader' হিসেবে। প্রতিটি

মতামতেরই সুর প্রায় একই রকম - ডেমস্কি নাকি বিশাল বড় বিজ্ঞানী, আর মার্ক পেরাখ নাকি ডেম্বস্কির যুক্তি খন্ডন করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোক একটি জায়গায়ও বলেননি ঠিক কোন জায়গায় পেরাখ ভুল তথ্য দিয়েছেন, বা ভুল যুক্তির অবতারণা করেছেন। বোঝাই যায় যে, বইয়ের র‍্যাঙ্কিং ইচ্ছাকৃত নামানোর জন্যই দুই তিন নামে ভদ্রলোক নিজের মত দিয়েছেন আমাজানের ওয়েব-সাইটে। একই ভদ্রলোক আবার আরেক জায়গায় মার্ক পেরাখের বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে ‘ধান ভানতে শীবের গীত’ এর মতই একসময় হুট করে মার্ককে ছেড়ে মার্কের বইয়ের প্রকাশক *প্রমিথিউস প্রেস*কে আক্রমণ করা শুরু করে দিলেন এই বলে যে, প্রমিথিউস প্রেস নাকি এখন নাস্তিকদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে!

ক্যানাডিয়ান আমাজান ডট কম একবার ভুল করে হঠাৎ ছদ্মনাম নেওয়া রিভিউয়ারদের তালিকা প্রকাশ করে দেয়, আর তা থেকেই বেরিয়ে আসে ‘Reader from Waco, Tx’ কিংবা ‘Reader from Riesel, Tx’ অথবা ‘Reader’ আর কেউ নন, আমাদের স্বনামখ্যাত ‘আই.ডি’ বিজ্ঞানী - উইলিয়াম ডেম্বস্কি!

সর্বশেষ আপডেটঃ ৮- জানুয়ারী -০৫

———————————————————————————————

অভিজিৎ রায় পেশায় প্রকৌশলবিদ, মুক্ত-মনা (www.mukto-mona.com)র ফাউনডিং মডারেটর। ইমেইল : avijit@mukto-mona.com